বাবার প্লেন

শুজা রশীদ

বাবার ট্রেনিংয়ে যাবার দিন তারিখ ঠিক হয়েছে। ফেব্রুয়ারী মাসের ৭ তারিখে তার প্লেন ছাড়বে ঢাকা থেকে। আমার বড় ইচ্ছা ছিলো বাবার প্লেন উড়ে যাওয়াটা দেখবো। কিন্তু গ্রামে বসে কিভাবে সেই ইচ্ছা পূরণ হবে। ইদানিং মায়ের মন এবং শরীর কোনটাই বিশেষ ভালো দেখি না বলে তাকে আর সাহস করে জিজ্ঞেস করি না । মনে মনে আশা করে থাকি প্লেনটা যদি আমাদের গ্রামের উপর দিয়ে যায় তাহলে দেখা হবে। কিন্তু আসা অবধি কোন প্লেন এই এলাকার উপর কোথাও দিয়ে উড়ে যেতে দেখিনি। ফলে সেই আশা পূরণের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। তবুও আশা করতে দোষ কি? আমি প্রতিদিন সকালে উঠে দাদুকে তারিখ জিজ্ঞেস করতে ভুলি না। গ্রামে গেলে শীতের ফসল ঘরে তোলার দৃশ্য দেখতে সবচেয়ে ভালোলাগে। খুব একটা উৎসব উৎসব ভাব পড়ে যায় ঘরে ঘরে। দাদুর বাড়ির প্রশস্ত উঠোনে ধান মাড়াইয়ের ব্যবস্থা করা হয়। একটি বাঁশের খুটির সাথে তিন থেকে সাতটি গরুকে সমান্তরালে বাঁধা হয়। উঠোনের উপর ধানের শীষগুলিকে বিছিয়ে দিয়ে গরুগুলিকে তার উপর দিয়ে হাটানো হয়। ধীরে ধীরে গাছ থেকে ধানের কনাগুলি বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। বাংলার অধিকাংশ মানুষই এই দৃশ্যের সাথে অল্প বিস্তর পরিচিত। আমার কাছে সম্পূর্ণ ব্যাপারটি এতো ভালো লাগে যে আমি বোধহয় সারাদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গরুগুলির ছন্দবদ্ধ চক্কর দিয়ে হেটে চলা দেখতে পারি। জনমজুরদের ব্যস্ত চলাফেরা, ধানের গাছগুলোর উপরে গরুর খুরের ঘষ ঘষ শব্দ, বাড়ির মেয়েদের ধান সেদ্ধ করার উদ্যোগ এবং ঢেঁকিতে ধান ভানার ঢিব ঢিব ছন্দময় আওয়াজ সব মিলিয়ে অবিস্মরণীয় এক অভিজ্ঞতা। আমার খুব ইচ্ছা হয় মজুরদের সাথে ধানের ক্ষেতে চলে যাই যেখান থেকে তারা কাস্তে দিয়ে ধানের গাছ কেটে মাঝারি আকারের বোঝা তৈরী করে ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে আসে। দাদুর অধিকাংশ ফসলের ক্ষেতই ভিটেবাড়ির নিকটে। ফলে মজুরেরা হেটেই নিয়ে আসে। দূরে হলে গরুর গাড়ি ব্যবহার করা হয়। আমি মাকে অনেক সাধ্য সাধনা করেও আমাকে আলেকের সাথে যেতে দিতে রাজী করাতে পারিনি। দূর্ভাগ্যবশতঃ এবারে আমরা এসেছি শীত পেরিয়ে। আমার ধান ভানা দেখাটা হলো না।

ভিটেবাড়িতে দুটি আটচালা ঘর। একটিতে থাকেন দাদা ও দাদী বুবু। অন্যটিতে থাকেন ঝিমা। তার ঘরটা কিছুটা ছোট। সেখানেই দ্বিতীয় একটা খাটে আমি, মা ও রুশী শুই। ঝিমা বাড়ির তেমন কোন কাজ কর্মে হাত লাগান না। প্রথমতঃ দাদীবুবুর সাথে তার অলিখিত মনোমালিন্য আছে। ছোটখাটো কারণেও তাদের দুজনার মধ্যে চাপা গলায় ঝগড়া শুরু হয়। দাদীবুবু কখনো গলা উঁচিয়ে আলাপ করেন না। ফলে অধিকাংশ মানুষই বুঝতে পারে না তাদের ঝগড়া কখন শুরু হয় কখন শেষ হয়। সবাই শুধু ঝিমার কথাই অল্প বিস্তর শোনে। দ্বিতীয়তঃ ঝিমার চোখে সমস্যা আছে। বেশ কিছুদিন ধরেই চোখে ছানি পড়েছে। খুব ভালো দেখেন না। নিজের ঘর থেকে সিড়ি বেয়ে উঠোনে নামতে গেলেও তাকে হাতড়াতে হয়। বাবা তার ছানি কাটার ব্যবস্থা করবেন বলেছিলেন কিন্তু সময় হয় নি। বাড়ির অন্য কোন কাজ না করলেও ঝিমা তার ঘরের আঙ্গিনায় বসে বসে খবরদারি করতে ছাড়েন না। একটু পর পর খনা গলায় চিৎকার করে উঠে

উপস্থিত সকলের পিলে চমকে দেন তিনি। - এই মতি, গরু ঘা দে। ঘুমোয়ে পড়লে তো, এরাম করলি সারা মাসে ধান মাড়াই হবে না। ওরে ও আলেক, জোরে পা চালা। এক গাঁটি ধান আনতি তোর বেলা গেলি কাজ হবে কি কইরে, এ্যাঁ?

কেউ অবশ্য ঝিমার কথায় বিশেষ একটা কান দেয় না। বুড়ীকে সবাই যেমন পছন্দ করে তেমনি অপছন্দও করে। বিশেষ করে তার অকারণ খবরদারি কারো সহ্য হয় না। কিন্তু কেউ সাহস করে কিছু বলে না। ঝিমার মুখের ঝাল ভয়ানক। রেগে গেলে গুষ্টি ধরে গালাগালি শুরু করেন। সেই যন্ত্রনায় কেউ সহজে ঘাটাতে চায় না। কিন্তু বুড়ী আমাকে প্রচন্ত ভালোবাসে। এই বংশের একমাত্র পোতা হওয়ায় আমি বরাবরই একটু বিশেষ মর্যাদা পেয়ে থাকি। গ্রামাঞ্চলে এটি একটি প্রচলিত প্রথা। বংশের নাম ধরে রাখতে প্রয়োজন একটি পুত্র সন্তানের। আমার চাচুর কোন পুত্র সন্তান নেই। আমার জন্মের পর নাকি এই বাড়িতে ভয়ানক উৎসবের আয়োজন করা হয়। আমার নিজের কাছে নিজেকে বিশেষ কিছু মনে না হলেও অন্যেরা যে গুরুত্বের চোখে দেখেন সেটা নিতান্ত মন্দ লাগে না। ঝিমা আমার প্রতি বিশেষ রকম দূর্বল। জন্মের পর থেকেই একরকম তার ঘরেই থেকেছি রাতের পর রাত, তার কোলে কেটেছে ঘন্টার পর ঘন্টা, তার পালা মুরগির মাংস খেয়েছি অসুখ বিসুখের সময় এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো- তার প্রশ্রয় পেয়েছি ভীষণ রকম। কোন অন্যায় করে তার কোলের মধ্যে এসে উঠলে আর কারো ক্ষমতা নেই আমাকে কিছু করে। ঝিমা তাদের সাথে এমন ঝগড়া শুরু করতেন যে তারা বিরক্ত হয়ে সরে পড়তো। মা প্রায়ই ঝিমার মুখের সামনে পড়ে যান। দেশের বাড়িতে এলে মায়ের বকুনি আমাকে তেমন একটা শুনতে হয় না।

বাড়িতে এতো হৈ চৈ হলেও একজনের কথা খুব মনে পড়ে। সে হলো রানী আপা। আমার আশা ছিলো ইতিমধ্যেই আমরা নানার বাড়িতে একবারের জন্য হলেও যাবো। কিন্তু নানান কারণে সেটা হয়ে উঠেনি, বিশেষ করে নজরে পড়েছে মায়ের অদ্ভুৎ আচরণ। প্রায়শঃই সকালে মায়ের বমি বমি লাগে, কিছু খেতে পারেন না। বুঝতে পারছি কিছু একটা ঘটেছে সেটা আমাকে এখনো জানানো হচ্ছে না। আমি শেষে কৌতুহল আটকাতে না পেরে ঝিমাকেই জিজ্ঞেস করে ফেলি, ঝিমা রহস্য উন্মোচন করেন। আমার একটা ছোট ভাই বা বোন হবে। ব্যাপারটা ঠিক মাথায় ঢুকলো না। রুশী যখন হয়েছিলো তখনকার স্মৃতি আমার আদৌ মনে নেই। কিন্তু আরেকটি ভাই বা বোন হবার সাথে মায়ের শরীর খারাপ হবার সম্পর্কটা পরিষ্কার হলো না, কিন্তু মনটা খারাপ হলো এই ভেবে যে মায়ের শরীর খারাপের জন্যই আমাদের নানা বাড়িতে যাওয়াটা পিছিয়ে যাচ্ছে। এক দুপুরে গ্রামের ডাক্তার এলেন মাকে দেখতে। এটা সেটা কিসব টিপে টুপে তিনি হাসি মুখে জানালেন, সবাই যা ভেবেছিলো তাই সত্যি। মায়ের আবার বাচ্চা হবে। এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে আরো আগেই বোঝা যায়নি। মা খবরটা শুনে একটু মুচড়ে পড়লেন। এই অবস্থায় তাকে নাকি খুবই সতর্ক থাকতে হবে। দীর্ঘ যাত্রায় যাওয়াটা বর্জনীয়। যার অর্থ বাবার কাছে পশ্চিম পাকিস্তানে যাওয়াটা আমাদের পিছিয়ে যেতে পারে। মা কয়েকটা রাত খুব চুপি চুপি কাঁদলেন। আমি ভয়ে কোন প্রশ্ন করি না। রুশীও ভয়ে মাকে কিছু জিজ্ঞেস করে না। সে আমাকে নানান প্রশ্ন করে। আমি গম্ভীর মুখে তাকে আস্বস্ত

করবার চেষ্টা করি। মনে মনে আশা করি মা যেন নতুন একটি ভাই নিয়ে আসে। রুশীর মতো ছিঁচকাঁদুনি একটাই যথেষ্ট, দু'টা হলে আর এই বাড়িতে টেকা যাবে না।

ফেব্রুয়ারী মাসের সাত তারিখে বাবার প্লেন আকাশে উড়লো। বাড়ির সকলে সারাদিন ধরে বাবার আলাপ করলো। আমি ভয়ানক অস্থিরতা নিয়ে উন্মুক্ত আকাশের নীচে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। বাবার প্লেন যদি অনেক উচুঁতে আকাশ দিয়ে যায় তাকে এক নজর দেখতে পাই। কিন্তু সারাদিন অপেক্ষা করে কোন লাভই হলো না। মা সন্ধ্যার সময় নিজে এসে আমাকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে এলেন। আমি কাঁদো কাঁদো গলায় বল্লাম-বাবার প্লেন কোন পথে গেলো মা?

মা বললেন-এই পথে কোন প্লেন যায় নারে বোকা। চিন্তা করিস না আমরা ক'দিন বাদেই তোর বাবার কাছে চলে যাবো।

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ি। বাবার কাছে যেতে ইচ্ছে করে কিন্তু দাদুর বাড়ি ছাড়তে মন চায় না। এই রকম দোটানার মধ্যে বসবাস করা বড় কষ্টের ব্যাপার।

পশ্চিম পাকিস্তানে যাবার আগে বাবাকে লেফটেন্যান্ট থেকে ক্যাপ্টেন ডাক্তার পদোন্নতি দেয়া হয়। তার সিও-র লেটার সব রিকমেন্ডশনের উপর ভিত্তি করেই তাকে এই পদোন্নতি দেয়া হয়। কর্ণেল জাহাংগীর বাবাকে খুবই পছন্দ করতেন। তিনি শুধু যে একটি জোর রিকমন্ডেশন লেটার লিখলেন তাই-ই নয়, বাবাকে নিজ অফিসে ডেকে নিয়ে বললেন- ট্রেনিংয়ের পরে তোমার পোষ্টিং ত কোয়েটা ক্যান্টনমেন্টে, ওখানে কোন অসুবিধা হলে জেনারেল গুলের সাথে দেখা করো। ভদ্রলোক পাঞ্জাবী কিন্তু খুবই খোলা মনের মানুষ। আমার সাথে খুব ভালো বন্ধুত্ব। আমার পরিচয় দিও তাকে।

বাবাসহ আরো কয়েকজন সকলের কাছে বিদায় নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের এবোটাবাদের উদ্দেশ্যে দেশ ছাড়লেন। জায়গাটা পিন্ডির কাছাকাছি, নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্সের অন্ত র্ভূক্ত। সেখানে আর্মি মেডিকেল ট্রেনিং সেন্টার (ধৎসু সবফরপধষ ঃৎধরহরহম পবহঃবৎ) এ বাবার ট্রেনিং হবে। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছানোর পরপরই জানা গেলো যে ট্রেনিং ক্যান্সেল করা হয়েছে এবং সবাইকে সরাসরি তাদের কর্মস্থলে যোগ দিতে বলা হয়েছে। বাবার প্রথম পোস্টিং হলো কোয়েটায়। শহরটা বেলুচিস্থান প্রদেশের রাজধানী। বাবা কয়েকদিনের ছুটি চাইলেন পশ্চিম পাকিস্তান একটু ঘুরে ফিরে দেখার জন্য। কিন্তু ছুটির আবেদন নাকচ করা হলো। ফলে বাবা অন্যদের সাথে রওনা দিলেন কোয়েটার উদ্দেশ্যে। ট্রেন প্রথমে যাবে লাহোর, সেখান থেকে কোয়েটা দেড় দিনের পথ। এক মুল্লুক থেকে আরেক মুল্লুক। ট্রেনে বেশ কয়েকজনের সাথে পরিচয় হলো। সবাই পশ্চিম পাকিস্তানী, উর্দূভাষী। বাবা ভাঙা ভাঙা উর্দূ বলতে পারতেন। সেভাবেই তিনি সবার সাথে আলাপ চালিয়ে গেলেন। তার ধবধবে ফর্সা গাত্রবর্ণ ও ভাঙা উর্দূ শুনে সবাই তাকে পাঠান বলে ধরে নিলো। ফলে অনেকেই বেশ মন খুলে আলাপ করে। দেখা গেলো অধিকাংশই পূর্ব পাকিস্তানী নেতা শেখ মুজিবরের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার বিরোধী। তারা ভুট্টোকেই ক্ষমতায় রাখতে চায়, যদিও সে ভোটে শেখ মুজিবের কাছে হেরে গেছে। বাবা চুপচাপ তাদের কথা শুনলেন। অকারণ হুজ্জতে জড়ানোর কোন অর্থ হয়না। বোঝাই যায়

এদের কাছে গণতন্ত্রের অর্থ খুব পরিষ্কার নয়। কিন্তু একজন এডজুটেন্টের সাথে আলাপ হবার পর তার ধারণা খানিকটা পাল্টালো। এই ভদ্রলোক কাকুলের আর্মি ট্রেনিং সেন্টারে জিয়াউর রহমানের অধীনে ট্রেনিং করেছিলো। বাবা এই প্রথম একজন পাকিস্তানীকে পেলেন যার সাথে মন খুলে আলাপ করতে পারলেন। এডজুটেন্ট স্পষ্ট ভাষাতেই বললো, দেখো, আমি পূর্ব পশ্চিম বুঝি না। এই দেশের নীতি যদি ভোট দিয়ে নেতা বানানো হয়ে থাকে, তাহলে যে জিতবে সেই প্রধানমন্ত্রী হবে। ভোটে হেরে গিয়ে ভুট্টোর এইসব বাজে আলাপ আমার পছন্দ নয়। এভাবে চলতে থাকলে একটা গোলমাল বেধে যাওয়াটা অসম্ভব নয়। অন্যদের কথা জানি না। কিন্তু আমি বাঙালীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আগ্রহী নই। তারা শুধু আমার স্বদেশী নয়, তারা আমার স্বধর্মীয়ও বটে।

বাবা তার কাছে নিজের পরিচয় গোপন করেননি। জিয়াউর রহমানের অধীনে ট্রেনিংয়ের সূত্রে এডজুটেন্টের পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বোধহয় প্রচুর মমতা জন্মেছিলো। বাবা সেই বৈরী পরিবেশে তার বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারে খুব আনন্দিত হলেন।

নানু বাড়ি ও রানী আপা

অবশেষে মায়ের শরীর একটু ভালো হলো। যার অর্থ সকালে উঠেই মা যে ভয়ানক শব্দ-টব্দ করে বমি করছিলেন সেটা খানিকটা কমে এলো। নানু বাড়ি থেকে ইতিমধ্যেই দুবার খবর পাঠানো হয়েছে লোক মারফত। মা কবে যাবে? বলা হয়েছে শীঘ্রই। আমি অপেক্ষা করে আছি কবে সেই দিন আসবে। দাদু, দাদী ও ঝিমার অফুরন্ত ভালোবাসা পেলেও নানু বাড়ির মজা ছিলো ভিন্ন। সেখানে রানী আপা সহ অনেকগুলি ভাই-বোন আছে। তাদের সাথে খুব ছুটোছুটি করে খেলা করা যায়। মা একটু ভালোবোধ করতে নিজেই দাদুকে বললেন যাবার ব্যবস্থা করতে। তখনও যাতায়াতের বাহন একমাত্র গরুর গাড়ি। এক শুভদিনে আমরা দাদুর গরুর গাড়িতে চেপে রওনা দিলাম দরগাহপুরের উদ্দেশ্যে। গাড়ি আমাদেরকে পৌঁছে দিয়ে চলে আসবে। ফিরবার সময় নানু গাড়ি দেবেন। আমি স্বভাবমত লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নীচে নেমে অনেকদূর দৌড়ে গিয়ে কোন এক গাছের ছায়ায় বসে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করি। গরুর গাড়িটা মা এবং রুশীকে নিয়ে ঢুকুর ঢুকুর করতে করতে যেই আমাকে ধরে ফেলে আমি আবার দৌড়ে এগিয়ে যাই। মা এবং রুশীর তেমন কোন সমস্যা দেখি না। রুশী এমনকি বেশ আয়েশ করে একটা ঘুমও দেয়। এক দিক দিয়ে ভালো। ওর নাঁকি কান্না শুনতে হয় না।

নানু বাড়ি মাত্র কয়েক মাইলের পথ। আমাদের আত্মীয় স্বজনদের অনেকেই বসবাস করেন বিভিন্ন গ্রামে। যাত্রা পথে "গরুর গাড়িতে কে যায়" সন্ধান করতে এসে মাকে দেখে অনেকেই আকাশ থেকে পড়েন। -জায়রা তুই? কবে এলি? আমাদের বাড়িতে একটু বসবি নে?

গাড়ি থামাতে হয়। মা নামেন না কিন্তু বাড়ির মেয়েরা আধ হাত ঘোমটা দিয়ে বেরিয়ে আসে। কতক্ষণ খুব গল্প হয়। তারপর তাদের অনেক অনুনয় বিনয় ঠেলে গাড়ি আবার চলতে থাকে।

বিরক্তি লাগে আমার। এভাবে বিঘ্ন বাধা আসতে থাকলে নানু বাড়ি আর পৌঁছাতে হবে না। মা ডাকেন- ভেতরে এসে বয়, বাবা।

আমি কথা কানে নেই না। একদৌড়ে অনেকখানি এগিয়ে যাই। একটা লম্বা তালগাছের নীচে বসে অপেক্ষা করতে থাকি গাড়িটির জন্য।

আঁকা বাঁকা মেঠো পথ ধরে, গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে অবশেষে নানু বাড়ির পরিচিত আঙিনায় পৌঁছাই। লাল ইটের দেয়াল দিয়ে ঘেরা চত্বরটা চোখে পড়তেই আমার মনটা উত্তেজিত হয়ে উঠে। সবার আগে পেরিয়ে যাই বিশাল এক দিঘি এবং দিঘি সংলগ্ন মাদ্রাসা। ভেতরে পুরুষ কণ্ঠের সুরেলা কুরআন পড়বার ধ্বনি শুনতে পাই। গাড়ি গেটের মধ্যে ঢুকতেই হৈ হৈ রৈ রৈ করে রানী আপা তার ছোটদের বাহিনী নিয়ে ছুটে আসে। নানু বাড়িতে অনেক মানুষ। নানা সব মিলিয়ে চারটি বিয়ে করেছিলেন। শুনেছি অবস্থার পরিপাকেই। তার অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। অধিকাংশই ছোট ছোট। তারা সবাই আমার সম্পর্কে মামা-খালা হয়। রানী আপা তাদের সর্দার। সে আমার ফুফাতো বোন, আবার মামাতো বোনও। তার কথাতেই সব হয়। আমাকে কোলে তুলে নিয়ে খুব আদর-টাদর করলো রানী আপা। বেশ একটু লজ্জায় পড়ে গেলাম। আমি কি আর আগের মতো ছোট আছি?

আমার প্রকৃত নানী বেঁচে নেই। মায়ের জন্মের পর পরই তিনি মারা যান। মা বড় হয়েছিলেন আমার খালার কাছে। এই খালা থাকেন খুলনায়। মার একমাত্র আপন বোন। নানুর পক্ষের স্ত্রীরা এখন সংসার সামলান। তারা অনেকগুলি ছেলেমেয়ে নিয়ে সর্বক্ষণ বিব্রত থাকেন। তারপরও মায়ের গাড়ি এসেছে শুনে সবাইকে নিয়ে ছুটে এলেন। নানু গেছেন একটু বাইরে। সন্ধ্যা নাগাদ চলে আসবেন। মা সবকিছুতেই গোলমাল পাকাতে সিদ্ধহস্ত। নানু বাসায় নেই দেখে তিনি একটা হুলস্থুল পাকিয়ে দিলেন। চোখের পানি টানি ফেলে একাকার করলেন। - বাপজান আমারে মোটেই ভালোবাসে না। আমি আসবো শুনেও কেন বাইরে গেলো? বড় নানী সাবধানী কণ্ঠে বললেন-চলে আসবে। যেতে চায়নি কিন্তু না গেলে অসুবিধা হতো।

ছোট নানী বললেন-এইতো চলে আসবে। তুই ঘরে এসে বয় তোর জন্যি খাসী জবাই দেছে তোর বাপ।

মা ধমকে উঠেন-হ্যা, তোমাদের খাসী খেতে এসেছি আমি! খাসী আমি খাইনা শহরে? ওজন কয় সের হইছে?

–নয় সের!

–ছোট খাসী। বাপ আমাকে দূর করতে পারলেই বাঁচে।

মায়ের কান্ডকারখানা বোঝা আমার জন্য একটু অসুবিধাই। এতো সামান্য ব্যাপারে এমন কান্ড করবার কোন কারণ হয়? রুশীটাও গান ধরেছে-নানুকে দেখবো। নানুকে দেখবো।

'নানু ফিরলে দেখবি মা', ফুপুকে আসতে দেখে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আমার মায়ের বড় ভাইয়ের সাথে বাবার বড় বোনের বৈবাহিক সম্পর্ক। ফুপু খুব বুদ্ধিমতি আর বেশ চুপচাপ। তিনি এসেই রানী আপাকে বললেন-রানী, তুই খোকা আর রুশীকে নিয়ে খেলা করতে যা।

একটু পরে ফিরিস। ওরা খাওয়া দাওয়া করবে। জায়রা, তুই নামতো আগে। তোকে দেখার জন্য কত মানুষ উঠোনে জড় হয়েছে, আয়।

মা নামলেন। -বাপজানরে আমি দেখবোনে পরে।

ফুপু বললো- সে দেখিস খনে। এখন আয় ভেতরে।

আমার বড় মামা নানু বাড়ির পাশেই বাড়ি করে বসবাস করেন। আমরা নানু বাড়ি গেলে মামাবাড়িতেই সাধারণত রাত্রি যাপন করি। নানুর পুরানো দালান কোটায় কক্ষের সংখ্যা কম। সবার স্থান সংকুলান হয় না। নানুবাড়ি থেকে কেউ তাতে কোন আপত্তি করে না। খাওয়াটা অবশ্য ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ছোট নানী, বড় নানী আর ফুপুর ওখানে হয়।

মা শান্ত হতেই আমি রানী আপার পিছু নিয়ে পাড়া ঘুরতে বের হলাম। রুশী অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্ব করে অবশেষে আমাদের সঙ্গ নিলো। আমি সতর্ক করে দিলাম-একদম ছিঁচকাঁদুনি চলবে না। সে মুখ ব্যাজার করে মাথা নাড়লো।

নানুরা অনেকগুলি ভাই। সবাই একই গ্রামে থাকেন। বিশাল চত্বর ঘিরে তাদের বাড়ি। পাশের বাড়িটা ছোট নানুর। আমরা সেই বাড়ির উঠোন মাড়িয়ে পেছনের গেট পেরিয়ে আরেকটা বিশাল পুকুরের পাশ কাটিয়ে আম-জাম-কাঠালের বাগানের ভেতর দিয়ে দৌড়ে যাই। আমাদের কোন গন্তব্য নেই। শুধু ছুটতেই আনন্দ। রুশী বারবার পিছিয়ে পড়ছে। রানী আপা তাকে কোলে তুলে নিলো।

সারাদিন বাড়ি -বাড়ি ঘুরে, মহিলাদের গাল টিপুনি আর মিষ্টি কথা শুনে, শেষে প্রায় বিকালের দিকে বাড়িতে ফিরলাম আমরা। এখানে এলে আর মায়ের ভয়ে তটস্থ থাকতে হয় না। ফুপুই আমাকে রক্ষা করেন। -এতো পরে এলি তোরা? যা, হাত মুখ ধুয়ে আয় সবাই। আমি ভাত বাড়ছি। রানী, যা, ওদেরকে নিয়ে যা। মা চোখ পাকিয়ে মুখ খোলার চেষ্টা করছিলেন। আমরা তার আগেই এক দৌড়ে পুকুর অভিমুখে রওনা দিলাম।

শান বাঁধানো ঘাট। দু'টা বিশাল আম গাছ একেবারে নুয়ে পড়েছে পানির উপরে। খুব বড় বড় আর মজার আম হয় গাছ দুটোতে। আমরা পানিতে হাত-পা ধুয়ে ঐ শান বাঁধানো ঘাটের উপরেই কুত-কুত খেলতে লেগে যাই। আধঘন্টা খানেক পর ফুপু নিজে এসে রানী আপার কান ধরে নিয়ে গেলেন। আমরা সুড়সুড় করে তাদেরকে অনুসরণ করি।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে আমরা বাইরে চুলোর চারধারে সমবেত হই। খড় জ্বালিয়ে ছোট আগুন করা হয়। আমরা সবাই আগ্রহ ভরে খড় ঢুকাই। আগুন যেই লাফিয়ে ওঠে আমরা আনন্দে হাত তালি দেই। আমাদের আট-দশ জনের দলটা আগুন ঘিরে খুব উৎসাহ ভরে বসে থাকি। আকাশ থেকে সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু মুছে যেতে চারদিকে ঘন করে অন্ধকার নেমে আসে। আগুনের রক্তিম শিখাগুলো এবার বড় সুন্দর দেখায়।

রানী আপা প্রস্তাব দেয় 'বুড়ীচ্ছু' খেলার। আমরা হৈ হৈ করে সেই প্রস্তাব সমর্থন করি। সামনের প্রশস্ত চত্বরেই আমাদের খেলা শুরু হয়। রুশী খেলতে পারে না, তবুও সে খেলতে চায়। তাকে আমার পাশে বসিয়ে দেই।

নানু বাড়ি ফিরতে কিছু সমস্যা তৈরী হলো। মা খুব রাগারাগি শুরু করলেন তার সাথে। আজ মা আসবেন আর আজই নানুর বাইরে যাওয়ার সময় হলো। নিজের মা না থাকায় মাকে এইরকম অবহেলা সারাজীবন ধরে সহ্য করতে হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। ছোটবেলায় মাকে হারিয়ে ছিলেন বলে নানু তার এই মেয়েটিকে একটু বিশেষ স্নেহের চোখে দেখেন। তিনি বোকার মতো হাসতে লাগলেন। মা দীর্ঘক্ষণ বক-বক করে যখন থামলেন ততক্ষনে তার শরীরটা আবার খারাপ লাগা শুরু করেছে। নানু তাকে ধরে ঘরের ভেতরে নিয়ে বসালেন। এই যাত্রা ঝামেলা চুকলো। আমরা উঠোনে বসেই মায়ের কান্না শুনতে পেলাম। মায়ের ভাব-সাব বোঝা বড় দায়। এই হাসি এই কান্না।

'বুড়ীচ্ছু' খেলাটা এর পরে আর বেশী জমলো না। একটু রাত হয়েছে, বাচ্চাদের ঘুমানোর সময় হয়েছে। গ্রামের দিকে এমনিতেই সবাই রাত হবার সাথে সাথেই বিছানায় চলে যায়। আমরা রুশীকে মায়ের কাছে রেখে বের হলাম। মায়ের কান্না থেমেছে। তিনি চিৎকার করে ডাকলেন- এই শোন তোরা। কোথায় যাচ্ছিস? রানী! এই রানী। এই রাত্তির বেলা কই যাস?

রানী আপা বিড়বিড়িয়ে বললো - এই তো সামনে। এক্ষুনিই চলে আসবো।

আমার হাত ধরে টেনে দ্রুত সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে আসে সে। আমরা নানু বাড়ির অন্দর মহল পেরিয়ে, প্রতিবেশীর আঙিনা ডিঙিয়ে পুকুরের পাশ ঘেঁষে চলে যাওয়া সংকীর্ণ পথ দিয়ে দ্রুত হাঁটি।

আমি বলি-রানী আপা, কোথায় যাচ্ছি আমরা?

–একটা দোকানে। ঐতো আরেকটু সামনে। যা সুন্দর বিস্কুট পাওয়া যায়। তুই খেলে পাগল হয়ে যাবি।

–কি কি বিস্কুট পাওয়া যায়?

–অনেকরকম, তেঁতুল বিচির বিস্কুটটা সবচেয়ে মজা লাগে।

–তেঁতুল বিঁচি দিয়ে বিস্কুট বানায়?

–কি জানি। বলে তো তাই।

ছোট্ট একটা মুদির দোকান। একটা হারিকেন টিম টিম করে জ্বলছে। দোকানি লোকটা মাঝবয়সী, খুব রোগা। রানী আপাকে দেখেই তার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। -ওমা, তোরে কদিন ধরে দেখি না কেন? ছিলি কই?

রানী আপা বললো-মা রাতের বেলা এদিকে আসতে বারণ করে। লুকিয়ে চুকিয়ে আসতে হয়। তুমি আরো বেলা থাকতে দোকান খোলো না কেন চাচা?

–খুলতে তো চাই মা, কিন্তু আমি তো দিনের বেলা আরেকখানা কাজ করি। শুধু দোকান থেকে সংসার চলে না। তা, মারে আজ কি দেবো? এই খোকাটা কে?

–জায়রা ফুপুর ছেলে।

–তাই নাকি? এতো বড় হয়ে গেছে। কবে এলো ওরা? জায়রাটারে অনেকদিন দেখি নি। খোকা, আমি তোমার দুঃসম্পর্কের মামা হই। তোমার মারে বলো জব্বল মামার কথা। সে চিনবে। ছোট বেলায় আমরা একসাথে কত খেলতাম। তারতো মা ছিলো না, আমার মা তাকে খুব যত্ন করতো। তা, রানী মা, আজও কি তেঁতুল বিচির বিস্কুট দেবো?

রানী আপা কিছু বলার আগেই অন্ধকার থেকে আরেকটি কণ্ঠ ভেসে আসে-বিস্কুটের সাথে কিছু লজেন্সও দাও, চাচা।

রানী আপা পিছু ফিরে তাকায় না। বুঝলাম সে তাকে চেনে। আমি পিছু তাকিয়ে অন্ধকারে একটা অবয়ব দেখি। লোকটা একটু সামনে এগিয়ে এলে হারিকেনের আলোয় তার মুখটা অস্পষ্টভাবে দেখা যায়। দেখেই বুঝি সে রানী আপার চেয়ে বয়েসে অনেক বড়।

জব্বল মামা বললেন-বশীর, তুই খামাখা এই মেয়েটির পেছন লাগিস নাতো। যা, তোর বাপ-মাকে বল তোর জন্যি মেয়ে দেখতি।

বশীর একটু কড়া গলায় বললো-চাচা, কথাবার্তা একটু সামলে বলেন। আপনেরে যা বলছি তাই করেন। ওরে কটা লজেন্স দেন।

রানী আপা কড়া গলায় বললো-আপনার লজেন্স আপনি খান। আমার দরকার নেই চাচা, আমারে দু'টাকার বিস্কুট দেন।

লোকটা রানী আপার খুব কাছে এসে দাড়ায়। -এতো মেজাজ দেখাস ক্যা তুই? আমারে তোর পছন্দ না?

জব্বল মামা বললেন-ও তোর চেয়ে অনেক ছোটরে বশীর।

-আপনে চুপ করেন। রানী, আমি তোরে ভালোবাসি। বয়েস নিয়ে মাথা ঘামাস না। আমারে দেখতি বেশী বড় লাগে।

রানী আপা জব্বল মামার হাত থেকে বিস্কুটের প্যাকেটটা একরকম ছিনিয়ে নিয়ে দু'টা টাকা তার হাতে গুঁজে দেয়। বশীরকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে আমার হাত ধরে ফিরতি পথ ধরে রানী আপা।

পেছন থেকে বশীরের গলা শুনি-কোথায় পালাবি তুই? তোরে আমি ঠিকই ধরবো রানী।

রানী আপা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললো-আপনার নামে আজি নালিশ করবো।

–করিস, করিস, আমার কিচ্ছু হবে না।

রানী আপা দৌড় দেয়। আমিও তার পিছু নেই। নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে আমরা থামি। আমি বলি-লোকটা কে রানী আপা?

–সম্পর্কে আমার দুঃসম্পর্কের ভাই হয়। বদমায়েশ। আমার চেয়ে ডাবল বয়েস হবে। ইচ্ছে হয় লাথি দিয়ে মাজা ভেঙে দেই। আজ আমি বাবাকে বলে দেবো। ক'দিন ধরেই আমার পিছু লেগেছে। শয়তান। নে, বিস্কুট খা। ওর ব্যবস্থা আমি করতেছি।

বাসায় ফিরতে মা এবং ফুপুর যুগ্ম বকা খেতে হয়। এতো রাতে বাইরে যাওয়াটা কেউই পছন্দ করেন না। মামা বাড়ি ফিরেছেন। তিনি আবার রানী আপাকে অসম্ভব স্নেহ করেন। তিনি এই যাত্রা আমাদের রক্ষা করলেন।

ক'টা দিন যেন ফুর ফুর করে কেটে গেলো। দল বেঁধে গ্রামে গ্রামে ঘোরা, হাটে গিয়ে লজেন্স এবং বিস্কুট কেনা, বিলে ঘুড়ি ওড়ানো, পুতুলের বিয়ে দেয়া, কুতকুত খেলা, বুড়ীচ্ছু খেলা-সব মিলিয়ে এমন ভয়ানক ব্যস্ততায় যে দিনগুলি কাটলো। তবে এর মধ্যেই আমার মনে একটা ব্যাপার খুঁত খুঁত করতে লাগলো। যদিও রানী আপা ভয় দেখিয়েছিলো তবুও শেষ পর্যন্ত সে কাউকে বশীরের কথা বললো না। লোকটিকে আমার একেবারেই পছন্দ হয়নি। কেউ তাকে ধরে আচ্ছাসে দু'ঘা লাগিয়ে দিলে মনে খুব শান্তি হতো। আমার খুব ইচ্ছে হয় বড় হয়ে যেতে। আমি অনেক ছোট। একরাতে রানী আপার ঘরে আমরা চার পাঁচজন মিলে রাম-শ্যাম-যদু-মধু খেলছি। কাগজ কেটে ছোট ছোট তাসের মতো করে তাতে রাম, শ্যাম, যদু ও মধু লেখা হয়। তাসের মতো ভাগ বাটোয়ারা হয়। এরপর খেলা চলতে থাকে যতক্ষণ না হাত মিলে যায়। খুব মজার খেলা হারিকেনের আলোয় ভয়ানক মননিবেশ করে খেলছি আমরা। হঠাৎ আলেকের গলা শুনলাম। আমার মতো রানী আপাও খুব অবাক হলো। মায়ের কণ্ঠ শুনলাম। -কিরে আলেক? তুই হঠাৎ কেন? আলেক জড়ানো কণ্ঠে কিছু বলে। আমরা বুঝতে পারি না। ফলে কৌতুহল বশতঃ উঠোনে বেরিয়ে আসি। আলেক আমাকে জড়িয়ে ধরে।

–কেমন আছিসরে তুই? খুব মজা করছিস?

–কি হয়েছে আলেক ভাই?

আলেক দন্ত বিকশিত হাসি দিয়ে বললো-তোর চাচা-চাচী আর মীনু আপা আসছে। তোদের দেখতে চায়। তাই আমাকে পাঠালো তোদের নিতে।

আমার মনটা ঝট্ করে একটু খারাপ হলেও পরক্ষণেই ভালো হয়ে গেলো। মীনু আপা রানী আপার চেয়েও আরেকটু বড় কিন্তু সেও আমাকে খুব ভালোবাসে। তার সাথেও আমার সময়টা ভালো কাটে। ফুপু বললো-গাড়ি নিয়ে আসছিস তো, আলেক?

–হ্যাঁ চাচী। গাড়ি উঠোনে রাখছি। কাল সকালে রওনা দিতি হবে। নাহলে বড় গরম পড়ে যাবেনে।

মায়ের মনটা মনে হলো খারাপ হয়েছে। তিনি বিড়বিড় করে বললেন-দুটো দিন বাপের বাড়ি এসে একটু থাকার জো নেই। এখন তাদের কে আসতে বলেছিলো? যত্তোসব!

রানী আপা হঠাৎ করে বললো-মা, আমিও যাবো? কাল পরশু স্কুল বন্ধ।

ফুপু একটু চিন্তিত মুখে বললেন-যাবি? ফিরবি কার সাথে?

–কেন? আলেকের সাইকেলে আসবোনে। এই আলেক, তোর সাইকেলের পেছনে প্যাসেঞ্জার সিট আছে না?

–তাতো আছে আপা। মাঝে মাঝে হেলিকপ্টার চালাই তো। আমি দিয়ে যেতে পারবো নে চাচী। চিন্তা কইরেন না।

ফুপু ভ্রু কুচকে বললেন-তোর বাপকে জিজ্ঞেস কর। শেষে আমার উপর রাগ করবেনে।

মামা মেয়ে বলতে পাগল। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন। আমাদের আনন্দ আর দেখে কে? রাতটুকু যেন ঘোরের মধ্যে কেটে গেলো। পরদিন আলো ফোটার আগেই পথে নামলাম আমরা। গরুর গাড়ির ক্যাচর-ক্যাচর শব্দ যথারীতি ভোরের সুমসাম আবহাওয়াকে হেচড়ে পেচড়ে এগিয়ে নিয়ে চললো আমাদেরকে। আমি আর রানী আপা সুযোগ পেলেই লাফিয়ে নেমে পড়ি। দৌড় দিয়ে চলে যাই অনেক দূরে। কখন যেন মাইল পাঁচেক পথ ফুরিয়ে যায়।

চাচু আমাকে দেখে হাসলেন। - খুব ঘুরলি নারে খোকা? রানী দেখি এসেছে। আয় মা। ভালো ছিলি তো? ও মীনু। দেখ কারা এসেছে। মীনু আপা দৌড় দিয়ে এলো। -সেই কখন থেকে তোদের জন্য বসে আছি।

প্রায় তাৎক্ষণিকভাবেই আমাদের একটি ক্ষুদ্রবাহিনী তৈরী হয়ে গেলো। আমার দুঃসম্পর্কের ফুপুর ছেলেমেয়েরা আমাদের সাথে যোগ দিলো। খুব হৈ চৈ করে বনভোজনের আয়োজন করা হলো। রানী আপা, মীনু আপা হচ্ছে রাঁধুনী। আমরা বাচ্চা-কাচ্চারা কাঠ-পাতা কুড়ানো লোক। দাদীর মুরগী জবাই দিয়ে সেই মাংস আলু দিয়ে রান্না করা হলো। কি তার ঘ্রাণ! ভাত রান্না হলো। আমি আর আলেক গিয়ে কলা পাতা কেটে নিয়ে এলাম। সবাই মিলে মহা তোড়জোড় করে সেই কলাপাতায় খাওয়া হলো। এমনকি মা, চাচা, চাচীও এসে বসে পড়লেন খেতে। তরকারিতে লবনের ছিঁটে ফোটা না থাকলেও সবাই খুব চেটেপুটে খেলাম। রানী আপা মুখ বা কিয়ে বললো - যাহ্, নুন দিতেই ভুলে গেলাম!

খুব একটা হাসির রোল পড়ে গেলো।

রানী আপা দিন দুয়েক থেকে ফিরে গেলো। মামার আদুরে মেয়ে। মামা নিজেই সাইকেল চালিয়ে চলে এলেন। রানী আপা মামার সাইকেলের হ্যান্ডেলে বসে চলে গেলো। আমার একটু মন খারাপ হলো। মা বললেন - ভাবিসনে। আমরা শিগগির আবার যাবো।

আমি মনে মনে ভাবলাম, সেটা বিশেষ মন্দ হবে না। মীনু আপাও আমাকে খুব আদর করে কিন্তু সে অতো ছুটাছুটি করে না। তাছাড়া সে গ্রামেও থাকে না। মাঝে মাঝে সাতক্ষীরা থেকে বেড়াতে আসে। তবুও আমরা দুজনই বেশ ঘুরলাম বাড়ি বাড়ি। গ্রামের মেয়েদের মধ্যে মীনু আপুর কয়েকজন বান্ধবী আছে। তাদের বাড়িতে যাওয়া হলো। অনেক আদর যত্ন করলো তারা আমাকে। এই এলাকার মোড়ল বাড়ির বেশ নাম-ডাক রয়েছে। সবাই সমীহ করে। চাচা সাতক্ষীরার নাম করা শিক্ষক, বাবা পরোপকারী ডাক্তার। দাদুও ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট, সমগ্র জীবন সততার সাথে জীবন যাপন করেছেন। মানুষের শ্রদ্ধা পেতে তাদের কোন অসুবিধা হয় না। তাদের বড় পৌত্র হিসাবে আমাকেও গ্রামের অনেকেই চেনে। বয়েসী মানুষেরাও আমার সাথে আদর করে কথা বলেন।

বাড়িতে বেশ কদিন ধরেই ভালো মন্দ রান্না হচ্ছে। দাদী প্রায় প্রতি দিনই হয় মুরগী নয়তো হাঁস জবাই দেন। দাদুও হাট থেকে গরু অথবা খাসির মাংস কিনে আনেন। চাচু এবং চাচী তেমন খাওয়া দাওয়া করেন না কিন্তু দাদী তাদের নিষেধে কর্ণপাত করেন না। বড় ছেলের

প্রতি সব মায়েরই যে বিশেষ রকম দূর্বলতা থাকে তা বোধহয় মিথ্যে নয়। প্রায়শঃই অতিথি অভ্যাগতদেরও আগমন হয়। গ্রামের মুরুব্বীরা আসেন, দহলিজ ঘরে হারিকেনের আলোতে বেশ জোর আলাপ শুরু হয়। অধিকাংশই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে। ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা মানতে চায় না। সে চেষ্টা করছে মুজিবকে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখতে। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ কেন সেটা মেনে নেবে? পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা জাতীয়তাবাদের ধুয়ো তুলে পূর্ব পাকিস্তান শুষতে চায়। এদিকের মানুষের কল্যানের প্রতি তাদের কোন নজর নেই। মানুষ তাদেরকে কেন বিশ্বাস করবে? মুজিব ঠিকই বলেছে। আমাদের প্রয়োজন সার্বভৌমত্ব। নিজেদের নেতারাই হবে আমাদের শাসক, কোন পশ্চিম পাকিস্তানী নেতা নয়। এই ধরণের অনেক আলাপ হয়। আমি এতো কিছুর মধ্যে শুধুমাত্র এই টুকুই বুঝি যে - ব্যাটা ইয়াহিয়া আর ভুট্টো হচ্ছে ভিলেন, মুজিব হচ্ছে হিরো। একদিন মুজিব সবক'টা ভিলেনকে ধরে খুব করে ঠেঙিয়ে দেবে। এরচেয়ে বেশী কিছু বুঝবার বা জানবার কোন কারণ দেখি না। কিন্তু রেহাই পাওয়া যায় না। চাচা আমাকে কাছ ছাড়া করেন না। দহলিজ ঘরের ভিতরের বারান্দার এককোণে আলেকের শয্যা। সে একটু পর পর গলা খাকারি দিয়ে আমাকে ডাকে। আমি মাঝে মাঝে বাথরুমে যাবার নাম করে বেরিয়ে আসি। আলেক আমাকে নিয়ে পেছনের বাঁশবনের পাশের পুকুরটার পারে গিয়ে বসে। তার হাতে যাদুর বাঁশির মতো চলে আসে বাঁশের বাঁশি। সে খুব করুণ সুরে বাঁশি বাজাতে পারে। মনে হয় যেন বাঁশ ঝাড়ের ভুত পেত্নীরাও থমকে দাঁড়িয়ে সেই সুর শোনে। আমার শরীর শির শির করে। ভুত-পেত্নীরা বিশেষ সুবিধার মানুষ না।

চাচা থাকতে থাকতেই গ্রামে মুরুব্বীদের একটা সমাবেশ হলো। দেশের পরিস্থিতি যেভাবে খারাপের দিকে মোড় নিচ্ছে একটা যুদ্ধটুদ্ধ বেধে যাওয়া অসম্ভব নয়। তেমন অবস্থায় গ্রামের সাধারণ মানুষজনের কি কর্তব্য হবে সেটা নির্ধারণ করাই উদ্দেশ্য। মিটিং হলো দাদার উঠোনে। চারদিকে মাটির দেয়াল ঘেরা বিশাল উঠোন। একধারে চারখানা বড় বড় গোলা এবং অন্যধারে লম্বা গোয়াল। উঠোনের মাঝখানে খেজুরের পাটি আর চেয়ারে সবাই বসেছে। যাদের সেখানে স্থান হয়নি তারা গোল করে দাঁড়িয়েছে। মোতালেব চাচা খুবই স্বাধীনতাকামী মানুষ। মুজিব বলতে অজ্ঞান। তিনি খুব জোর গলায় বললেন, দেশে যুদ্ধ লাগলে জোয়ান ছেলেদেরকে যুদ্ধে যেতে হবে। আলেকের বড় ভাই মতি ভাই তাতে মনে হলো খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলো। পারলে সে তখনই কিছু একটা করে ফেলে। শহীদ চাচার মুখ অন্ধকার হয়ে এলো। বুঝলাম এই সব যুদ্ধটুদ্ধ তার পছন্দ নয়।

চাচাকে বক্তব্য রাখতে হলো। চাচা ঠান্ডা মাথায় কথা বললেন। যুদ্ধের সম্ভাবনা যে নেই তা নয় কিন্তু এখনও ভালোয় ভালোয় ব্যাপারটা মিটে যেতে পারে। ইয়াহিয়া খানতো আর একেবারে বোকা নয়। পূর্ব পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ লাগিয়ে যে ফায়দা হবে না এটা কি সে বোঝে না। যুদ্ধ কারো জন্যেই ভালো নয়।

অকারণে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে চিৎকার করতে করতে কিছুক্ষণ দৌড়াদৌড়ি করলাম আমরা ছোটরা সবাই। একটু পরেই নিজেদের অজান্তেই যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা শুরু হয়ে গেলো। শুকনো

লাঠি হলো আমাদের বন্দুক। খুব টা-টা-ঠা-ঠা চলতে লাগলো চারিদিকে। সেই খেলা শেষ হতে হতে বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো।

অবশেষে বড়দের মিটিংও ভাঙলো। মানুষ দল বেঁধে যে যার বাড়িতে ফিরে যেতে লাগলো। ভাঙা ভাঙা অনেক কথা কানে এলো। কেউ যুদ্ধ চায় কেউ যুদ্ধ চায় না। কেউ স্বাধীনতা চায় কেউ মুসলিম পাকিস্তানের সাথেই থাকতে চায়। ভারতের সাথে জোট পাকাতে তারা রাজী নয়। মালাউনের দল! হিন্দুদেরকে যে মালাউন বলা হয় সেটা বুঝে গেছি। অশ্রদ্ধা করে বলা হয়। ধর্ম ব্যাপারটার যাদু ততদিনেই অল্প সল্প বুঝে গেছি। মুসলমানরা যে হিন্দুদের চেয়ে অনেক ভালো সে ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ঠিক কি কারণে ভালো সেটা পরিষ্কার নয়। গ্রামে যে কয় ঘর হিন্দু আছে তারা অধিকাংশই গরীব, পরিশ্রমী। তাদের কথাবার্তায় মাধুর্যের কোন অভাব নেই। তারা লুঙ্গির বদলে ধুতি পরে, কপালে তিলক দেয়, মেয়েরা সিঁদুর পরে। শুনেছি তারা কচ্ছপ আর কাঁকড়া খায়। কখনো খেতে দেখিনি কিন্তু হাটে বিক্রি করতে দেখেছি। কমলদা দাদুর বাড়ির সমস্ত খেজুর গাছ কেটে ভাড়ে করে রস নিয়ে আসে শীতের সময়। সেই রস জ্বাল দিয়ে গুড় করা হয়। আমাকে দেখলেই মজা করে বলে - কি গো দাদাবাবু। রসের সময়ে এলে না। গুড় খেয়েছো তো? তোমার দাদীর গুড়ের স্বাদই আলাদা। কমলদা লোকটা ভালো। তার কপালে বিশাল একটা ফোঁড়া। বাবা বলেন টিউমার। তাদের বাড়িতে গিয়ে আমি একবার পূজার প্রসাদ খেয়েছিলাম বলে মায়ের হাতে বকুনি খেতে হয়েছিলো। সেখানে আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে আলেকের উপর দিয়ে অনেক ঝড় গিয়েছিল। অথচ চাচুর সংগে ঐসব হিন্দুদের বাড়িতে কতবার গিয়েছি, খেয়েছি। চাচুকেত দেখিনি তাদের আলাদা করে দেখ্‌তে।

চাচারা চলে গেলেন মিটিংএর দুতিন দিন পরেই। দাদুকে খুব চিন্তিত দেখলাম। মা মামার বাড়ি যেতে চাইলেন কিন্তু দাদু মত দিলেন না। বললেন, দেশের পরিস্থিতি ভালো না। আমাদের গ্রাম ভারতের সীমান্তের এতো কাছে। আমাদের গ্রামে থাকাটাই হয়েতো সমীচিন নয়। মা অল্পেই ঘাবড়ে যান। তিনি কান্নাকাটি করে বেশ একটা ঝামেলা পাকিয়ে ফেললেন। - তখনই বললাম আমাদের সাথে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে চলো। তা না, এই গ্রামে রেখে গেলো। যুদ্ধ লাগলে আমরা কোথায় যাবো --------- ।

মায়ের সাথে সুর মিলিয়ে রুশীও কান্না ধরে।

ঝিমা মুখ ঝামটা দেন। - তোরা মা-বেটি মিলে খুব মড়া কান্না জুড়ে দিলি দেখি। থামবি?

শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো আমরা খুলনায় খালার বাড়িতে চলে যাবো। বাবা যতদিন না আমাদের নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেন ততদিন আমরা সেখানেই থাকবো। গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে শুনে মনটা খারাপ হলেও খালার বাড়িতে যাবার কথায় বেশ একটু ফূর্তিও হলো। সেখানে আমার দু'জন ভাই আছে। বয়েসে অনেক বড় হলেও তাদের সাথে খুব হৈ-হুল্লোড় করে খেলাধুলা করা যায়। খালা-খালুও খুব আদর করেন। নিজের বাড়ির মতো করেই থাকা যায়।

শুজা রশীদ, টরেন্টো, কানাডা